পেয়েছি প্রাণ ভরে
সুবীর মুখার্জী

যে শিশুকে আজ থেকে চব্বিশ বছরেরও কিছু বেশি সময় আগে বুকে করে বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম, সে আজ স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রী। তাকে বাড়ি আনার আগের স্মৃতি আর চব্বিশ বছরের চড়াই-উৎরাইয়ের স্মৃতি বড় কম নয়।

যখন একটি শিশুসন্তানের পিতা বা আমার স্ত্রী 'মা' হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিলাম বা ছিলেন, তখন সেই স্বপ্ন অধরা থেকে যাচ্ছিল। হয়তো বা দূরেও চলে যাচ্ছিল। অকস্মাৎ মনে আসে দত্তক প্রথার কথা। তখন চোখের সামনে আমার দুই বন্ধুর জীবন দত্তক নেওয়ার ইচ্ছাকে আরও বেশি করে উস্‌কে দিল। যেমন ভাবা তেমন একটু একটু করে ওপথে যাওয়ার কাজ শুরু করা। এই ছোট্ট পরিসরে তার সবটা লেখা সম্ভব নয়। তবু, যে অভিজ্ঞতার কথা না বললে এই লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তা হল আমার মায়ের কথা। একদিন সন্ধ্যায় মা'কে বললাম, "মা, আমরা সন্তান দত্তক নিতে চাই"। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন। বললেন যাতে আমাদের সুখ তাতেই তাঁর সম্মতি আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "যাকে বাড়ী নিয়ে আসব, তার ধর্ম নিয়ে তোমার মনে কোনও দ্বিধা থাকবে না তো"। আমার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত মানবিক সুরে বললেন, "বাবা, মানুষ কি কোনও ধর্ম নিয়ে জন্মায়? যার ঘরে বড় হয়, তার যে ধর্ম হয়, শিশুটির ধর্মও তা-ই হয়"। বলে আমায় প্রশ্ন করলেন, "তুমি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' পড় নি? গোরা হিন্দুর ঘরে বড় হয়ে তার দ্বিধা-সংকোচের অবসানের আগে হিন্দু ধর্মই পালন করেছে। তাতে পৃথিবীর কোন ক্ষতিটা হয়েছে? সুতরাং, ওসব না ভেবে যা করতে চাও তা তাড়াতাড়ি করে ফেলো"। একটি কঠিন কথা সহজভাবে বলে আমার পথ মসৃন করে দিলেন আমার মা।

প্রাক্-দত্তক পর্বের শেষ কাজ হল শিশুটিকে পছন্দ করা। যদিও 'পছন্দ' শব্দটিতে আমার আপত্তি আছে। বাচ্চাটিকে দেখার দিন সস্ত্রীক পৌঁছে গেছি। শিশুভবনের সিঁড়ির অর্ধেক উঠে গেছি, হঠাৎ আমার স্ত্রী আমার হাত চেপে ধরে বলে উঠলেন, "আমি আমার না দেখা মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি। বাজারে শাড়ী কিনতে আসিনি। সুতরাং, ভালোবেসে যাকে আমার কোলে তুলে দেবে, সেই আমার মেয়ে। বাচ্চা বেছে নেওয়ার মত হীন কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়"। জীবনের আরেকটা কঠিন কাজ সহজ হয়ে গেলো। একটি শীর্ণকায় শিশুকে আমাদের কোলে তুলে দিলেন। ওর আর কিছু না থাক, ছিল গালভরা ভুবন ভোলানো হাসি। ওর অসুস্থতাকে সারিয়ে সুস্থ-স্বাভাবিক করে তুলতে কিছুদিন সময় গিয়েছে। কিন্তু, বিশ্বাস করুন, কখনও বিরক্ত হই নি।

তারপর পায়ে পায়ে চব্বিশ বছর অতিক্রম করা। স্কুলজীবনের অনেকটাই ভালো কাটেনি। গভীর 'ডিস্‌লেক্সিয়া'-র সমস্যা ছিল। অর্থ্যাৎ, বানান ভুলের সমস্যা। এককথায় বোঝানো যাবে না। সেই পর্বে সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই বিশেষ প্রশিক্ষক শ্রীমতী লিপিকা ভট্টাচার্য্যের প্রতি। পরম যত্ন এবং ভালোবাসায় আমার মেয়েকে এই সমস্যা থেকে মুক্ত করেছেন। প্রষ্ফূটিত কন্যাকে দেখলাম বারো ক্লাসের পরীক্ষার সময় থেকে।

এই চলার পথে কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণের যে সমস্যা তাকে অন্য সব বাবা-মায়ের মত আমাদেরও অতিক্রম করতে হয়েছে। সেই পর্বে তার মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বা না দিয়ে ধৈর্য্যের সাথে সমস্যাকে মোকাবিলা করেছি। একটা সময় মেয়ে নিজেই নিজের মধ্যে স্থিতধী হতে পেরেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঠিক বা ভুলের সীমারেখা টানতে শিখেছে।

আজ সে দায়িত্বশীলা। মায়ের অসুস্থতায় রান্না করে আমাকে ও মা'কে খেতে দেয়। মায়ের অসুস্থতায় বিচলিত হয়ে নিজেই চিকিৎসকের সাথে কথা বলে। জীবন আমাদের পরিপূর্ণ। এই পূর্ণতা অন্যদের জীবনেও আছে, হয়তো একটু অন্যরকম ভাবে। যাঁরা সদ্য দত্তক নিয়েছেন, বা নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন, তাঁদের জন্যও অপেক্ষা করছে এই পুর্ণতা।

রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত উক্তি দিয়ে লেখা শেষ করি:

"সম্পর্ক রক্তের বাঁধনে নয়,
অনুভূতির বাঁধনে তৈরী হয়"।

আমি এবং আমার স্ত্রী, নবনীতা মুখার্জী, আমাদের মেয়ে সেমন্তীকে নিয়ে ২০০০ সালে আত্মজার জন্মলগ্ন থেকে তার সাথে বিভিন্নভাবে যুক্ত আছি। সেমন্তীকে নিয়ে আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা সবার সাথে ভাগ করে নিতে পেরে আনন্দলাভ করলাম।